কোরান না বোঝার কারণ

জামিলুল বাসার

প্রথম ও সর্ব প্রধান কারণ:

আরবী ভাষা না জানাই প্রধান কারণ। তবে আরবী ভাষীগণ প্রধানত হযরত আলীর পর থেকেই মোসলেমত্ব ত্যাগ করে (মোরতাদ) শিয়া, ছুন্নী, ওহাবী খারেজী রাফেজী,আহ্‌মদি ইত্যাদি দল উপদলে পরিচিত হয়ে পড়েছে। আরবী বাদশাগণ আল্লাহর কাছে যা চাইবে তা আগেই জবর দখল করে বরং উহা রক্ষায় রচিত শরিয়তের নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাতই মোক্ষম ধর্ম বলে সরকারীভাবে গৃহীত করেছেন। এর বাহিরে কোরান গবেষণায় তাদের তিল পরিমাণও আগ্রহ নেই, নেই প্রয়োজনও। কারণ তাতে বাদশাহী হারাবার ভয় আছে বলেই: পড়লে ছোয়াব, মুখস্ত করলে ছোয়াব, শুনলে ছোয়াব, ছুইলে ছোয়াব ইত্যাদি অপ-প্রচার প্রতিষ্টা করে আরাম প্রিয় সহজ-সরল মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রধান কারণ

ভাষার মাধ্যমে ভাব প্রকাশের প্রধানত ৩টি পথ: গদ্য, পদ্য ও গান। গদ্য: কথা, বাণী বা বক্তৃতা। পদ্য: পদে পদে মিল রেখে যা বর্ণিত হয়। গান: সুর বা লহরীর মাধ্যমে যে ভাব বা গদ্য-পদ্য প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একই বিষয় মনের ভাব কথার মাধ্যমে প্রকাশকে গদ্য, ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশকে পদ্য ও সুরের মাধ্যমে প্রকাশকে গান বলে।

একটি মানুষের যেমন ৩টি স্থুল দেহ ঠিক তেমনই ৩টি জীবণ দেহ যথা: স্থুল, সুক্ষ্ম ও জ্যোতি বা নূর দেহ (বিস্তারিত ধর্ম দর্শনে আছে)। প্রধানতঃ গদ্য স্থুল দেহের, পদ্য সুক্ষ্ম দেহের, এবং গান জ্যোতি দেহের ভাষা। জ্যোতি দেহই আল্লাহ। আল্লাহু নূরুচ্ছামাওয়াতি অল আর্দ্ব; অর্থ: উপাস্য দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্যোতি। এই নূর দেহের ভাষাই গান। গানের ভাষাতেই আল্লাহ কথা বলে বলেই অতীতের সকল ঐশী গ্রন্থগুলি সুর-ছন্দ বা গানের মাধ্যমে নাজিল হয়েছে। এই কোরান ও তাই। পক্ষান্তরে, এই সুর তথা গানকেই শরিয়ত হারাম ঘোষণা করেছে! যদিও এই সুর ছাড়া আলেমগণ ওয়াজ-নছিহতও করতে পারেন না ; যেখানে সুর একেবারেই অবান্তর, অর্থহীন এবং অবাঞ্চিতও বটে!

মানুষ কঠিণ ধ্যান গবেষণা করে যখন নিজের নূর দেহের সন্ধান পায়; তখনই আল্লাহর প্রেরণা উপলব্দি করে; অতঃপর এই স্থুল দেহের মাধ্যমেই জ্ঞান ও বিজ্ঞান স্ব-স্ব মাতৃভাষায় প্রকাশ পায় এবং উহাই অহি; ইহারও ৩টি ধারা: জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শণ (৪২: ৫১)। এই ৩টি অধ্যায় যারা পৃথক করে দেখে তাদেরকে সম মাত্রায় ভিন্ন মুখী মৌলবাদী বলা যায়। এদের উপমা: বাপ (জ্ঞান), মা (দর্শন), সন্তান (বিজ্ঞান); অথচ কেউ কাউকে স্বীকৃতি দেয় না।

সৎ বা আদর্শ কর্মীগণ (জ্ঞানী-বিজ্ঞানীগণ) এই নূর দেহের সন্ধান পায় বলেই কোরানে তাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নবী-রাছুল সমাজের লোক বলে ঘোষণা করে [৯৮:৭]। বেশি-কম এই নূর দেহ প্রাপ্ত লোক ছাড়া আল্লাহর গানের সঠিক অনুবাদ অসম্ভব। তবে হ্যাঁ! কোরানের প্রধানত: 'মোহকামাত' অর্থাৎ আদেশ নিষেধ সুচক আপেক্ষিক অনুবাদ করতে পারেন বটে! কিন্তু 'মোতাসাবেহাত' অর্থাৎ রূপক বা দর্শন অধ্যায়ের সঠিক অনুবাদ করা সম্ভব নয় যেহেতু তা অভিধানের উর্দ্ধে ও বহুমুখী। 'কোরান' নামক শ্লোক, গীত-গীতা বা গানের অনুবাদ এমন জ্ঞানী দ্বারা অনুদিত হয় নি; ভাষাবিদ বা শিক্ষিতদের দ্বারা অনুদিত হয়েছে। যাদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রাপ্ত শিক্ষা ও অভিধানের শৃংখলে বন্দী। কোরানের কাগজ-কালি, অক্ষর, ভাষা-বাক্য বা আভিধানিক অর্থই কোরান নয়, কোরানের উপলব্দি, মর্মার্থই কোরান। উহা জ্ঞানীদের জন্য সহজ, সরল। মাষ্টার বা ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে শিক্ষিত রবোট দাবি করা যায় কিন্তু স্ব-জ্ঞানী ভাবাই নির্বোধের ফাইনাল পরিচয়।

সাধন-গবেষণা করে যারা মানব কল্যাণের স্থায়ী পথ ও মত্ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন, তারাই প্রকৃত আলেম, আল্লামা বা জ্ঞানী-বিজ্ঞানী; জ্ঞান (পরিকল্পনাও বলা যায়) যখন স্থুল বা বস্তুতে রূপ নেয় তখন সে বিজ্ঞানী বলে পরিচিত হয়। এই জ্ঞানীদের আবিষ্কৃত বিষয় শিক্ষা লাভ করে যারা কৃতকার্য হন তারাই শিক্ষিত। শিক্ষা বস্তুতঃপক্ষে জ্ঞানের পথ প্রশস্ত করে ; কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে, বিশ্বের অধিকাংশ জ্ঞানীগণই অশিক্ষিত ছিলেন; পক্ষান্তরে, অধিকাংশ শিক্ষিতগণই প্রাপ্ত শিক্ষার শৃংখলে রবোট হয়ে জ্ঞানী হতে ব্যর্থ হচ্ছেন। শিক্ষিত লোকের অনুবাদের একটি সহজ-সরল উপমা নিম্নে লক্ষ্যণীয়:

"গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা/ কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।"

আভিধানিক (মোহকামাত) সরলার্থ: "আকাশে মেঘের গর্জন ও তুমুল বৃষ্টির মধ্যে কবি একা নিরুপায় হয়ে নদীর কিনারে বসে রয়েছেন।"

উল্লেখিত সরলার্থে কবির হিংসুক ভাষাবিদগণ লাইন দু'টির বিরুদ্ধে সহজেই অসংখ্য প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন; এমনকি কবিকে নির্বোধ, আহম্মক বলেও প্রমান করতে পারেন এবং এর পক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠ সমর্থনও পাবেন! মূলত কবি যে জ্ঞানের আলোতে, যে

প্রেরণায় বাণীগুলি আপ্ত হয়েছিলেন, অবিকল অনুরূপ আলোকপ্রাপ্ত বা প্রেরণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল পারেন তার সঠিক মর্মানুবাদ করতে। 'আটিয়া গাছে মারলাম তীর/ চোখ গেল জ্যাঠার।' কণ্ঠে পরাবো দ্বিতীয়ার চাঁদ/ খোপায় তারার ফুল।' লালন মলো জল পিপাসায়/ থাকতে নদী মেঘনা/ হাতের কাছে ভরা কলস তৃষ্ণা মেটে না। ও ঘাটের জল কইরাছে কাঁদা/ঘাটে যাসনে রাধা,' 'চোখের জলে মালা গাঁথিলাম,' হাতি ঘোড়া গেল তল/ ভেড়া বলে কত জল,' পুর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি' ইত্যাদি বাক্যগুলি ভুল, অসামঞ্জস্য, বিক্ষিপ্ত, ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপরীত! সুতরাং লেখকগণ আহাম্মক ইত্যাদি বলে যদি সমালোচনা, হাসি-ঠাট্টা করি! তবে বাসারকে 'পাগলে কি না খায়/ছাগলে কি না বলে' কেউ মন্তব্য করলে স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আরও হাস্য-রসের বিষয় যে, এমনকি সাধারণ কবিগণও যে দল বেঁধে মিলেমিশে কবিতা লিখে বা লিখা য়ায়, এমন শিশুসুলভ বিশ্বাস যারা করেন তাদের উচিৎ আমার মতই প্রাইমারী স্কুলে গিয়েই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুত্র শেখা। জ্ঞান দিয়ে বিজ্ঞান করুণ যে, মোহাম্মদের (সা) কোরান লেখার বৈঠকী সদস্যদের নাম ঠিকানা কাসেম সাহেবের আগে আবুজেহেলের জানা থাকলে মোহাম্মদের (সা) পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী!

বিশ্বের অসংখ্য ভাষায় কোরানের অনুবাদ হয়েছে সত্য কিন্তু তা আভিধানিক বা উল্লেখিত উদাহরণগুলির সরল অনুবাদসম বিধায় নব্য শিক্ষিতদের কাছে বিতর্কিত হয়! আবারও বলি যে, আজ পর্যন্ত কেহই ভাবানুবাদ বা মর্মানুবাদ করতে সক্ষম হয় নি বা সাহসও পাননি! যারা চেষ্টা করেছেন তারা ধর্মান্ধ কর্তৃক সর্বকালেই নিগৃহীত হয়েছেন, কাফের ফতোয়া পেয়েছেন, খুণ হয়েছেন এবং আজও হচ্ছেন। পরিহাস যে, উলঙ্গাময়ী তসলিমা নাসরিনের ৪ স্বামী দাবীটিও একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

তৃতীয় প্রধান কারণ

কোরান কেন সকল ধর্ম গ্রন্থই এমন গ্রন্থ, যা সাহিত্যের সাহিত্য, দর্শনের দর্শন বিজ্ঞান, বিশ্বের সমুহ গ্রন্থাদির গ্রন্থ; উহাতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত; দৃশ্য-অদৃশ্য, গোপন-প্রকাশ, আকাশ-জমিন, বস্তু-অবস্তু, অণু-পরমাণু, জীবন-মরণ-জীবন, রূঢ় জগত, চিন্তার জগত, উর্দ্ধ-নিম্ন জগত, জগতের জগত; এমন কিছু নেই যা ঐশী গ্রন্থে নেই। সেই গ্রন্থই বলছে:

১. [১৮: ১০৯; ৩১: ২৭] অর্থ: বল! আমার প্রতিপালকের বাণী লিপিবদ্ধ করবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হবার পুর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে; অতঃপর উহার অনুরূপ বার বার আরও সমুদ্র আনলেও শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর বাণী শেষ হবে না।
২. [৬: ৫৯] অর্থ: আর তার নিকট গুপ্ত তত্ত্বের চাবি--এমন কি মাটির নিচে এবং ঘন অন্ধকারে টাটকা বা পচা (শুষ্ক) একটি মাত্র অণু বা সৃষ্ট কোন বিষয় নেই, যা অত্র কিতাবে উল্লেখ করা হয় নি।
৩. [১০: ৬১] অর্থ: দৃশ্য-অদৃশ্যের অণু পরিমাণও তোমার রবের অগোচরে নহে। আর উহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ সবকিছুই এই কিতাবে লিখিত আছে।

এমন বাণীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও গবেষণা আদিকাল থেকেই কতিপয় ইমামগণ অভিধান, বাস্তব যুক্তি প্রমাণ বিবর্জিত তথা কোরান বিরুদ্ধ হাদিস, ফেকহা ইত্যাদি কয়েক ফোঁটা কালির আচরের চক্র জালে প্রায় সমুহ মুসলিম (!) জাতিকে আষ্ট্রে-পৃষ্ঠে বন্দী করে ফেলেছে। কোরান তথা ধর্ম জ্ঞান বলতে উহার বাইরে কেউ কিছু কল্পনা করতে পারে না এবং ঐ সীমানার বাইরে স্বাধীন ধ্যান-ধারণা ও গবেষণার পথ ও শক্তি সাহস উচু-নিচু, ছোট-বড়, আলেম-বে-আলেম প্রায় সকলেই হারিয়ে ফেলেছেন। একটি কওম বা জাতিকে ধংস করার একমাত্র পন্থা, তাদের ঐশী সংবিধান ছলে, বলে, কলা-কৌশলে যে কোনভাবেই হোক তা ভুলিয়ে দেয়া। এই একই অস্ত্র অতীত বর্তমান সকল জাতির ক্ষেত্রেই সমভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

পুরাকালে বেদ পড়া বা স্পর্ষ করা তো দুরের কথা! যদি প্রমান হয়েছে যে, অমুক শুদ্র পবিত্র বেদের বাণী শুনে ফেলেছে, আর অমনি পুরোহিত, ঠাকুর ও ব্রাহ্মণ নামধারী তৎকালীন অবতারদের স্বঘোষিত সেক্রেটারীগণ পিতল গলিয়ে শুদ্রের কানে ঢেলে দিয়ে তাদের উপনিষদের [হাদিসের] পায়রবী করে পুণ্য হাসিল করতেন। ঐ একই সুত্র স্থান, কাল ও পাত্রের বিবর্তন ও পরিবর্তন ভেদে আজ এরূপ দাঁড়িয়েছে: "কোরান পড়লে ছোয়াব, শুনলে ছোয়াব, প্রতি অক্ষর উচ্চারণ করলেই ছোয়াব! আকার-আকৃতিতে রাছুলের নকল সাজলেই ছোয়াব ইত্যাদি । অতঃপর বেহেস্তবাসী। জানা বা বোঝার দরকার নেই বা যা বুঝ দেয়া আছে তার বাহিরে যাওয়ার অধিকার নেই।"

চতুর্থ প্রধান কারণ :

১. কোরানের অনুবাদে গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য আরবী শব্দের বঙ্গানুবাদ না করে হুবহু আরবী অথবা উর্দু হিন্দি ও পারশী শব্দের ব্যবহারের কারণে সাধারণের পক্ষে এমনকি সরলার্থ বোঝাও কঠিন হয়ে পড়েছে, সকল অনুবাদেই অনুরূপ বটে।

২. অধিকাংশ অনুবাদকগণ পোষা ও পেশাদারী ছিলেন এবং সকলেই একই উদ্দেশ্যে একে অন্যের অনুবাদ নকল করেছেন! পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ভাববাদী জ্ঞানে মর্মার্থ উপলব্দি করে স্বাধীনভাবে অনুবাদ করতে কেউই সাহসী হন নি ; এমনকি শ্রদ্ধেয় গিরিশ চন্দ্র ও পিকথল সাহেবও নন। তারাও ভাষা পন্ডিতের অধিকারে এবং সরকারী বে-সরকারী পৃষ্টপোষকতায় নকল ও বড়জোড় আভিধানিক অনুবাদ করেছেন এবং তারা দার্শনিক ছিলেন না।

৩. কোরানের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার ফুটনোটে, ব্রাকেটে, উপরে-নিচে, ডানে-বায়ে এমনকি অনুবাদের যেখানে-সেখানে অসংখ্য মতামত লেখা আছে; এসকল ফুটনোট বা ব্রাকেটের লেখা কোরানের মধ্যেই পায় বলে সাধারণ পাঠকগণ সকল লেখাই কোরানের কথা বা অভ্রান্ত বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হন।

৪. তৎকালীণ কোরান সংকলন বোর্ড অনৈতিক-রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত ছিলেন না।

৫. কোরান দু'ভাগে বিভক্ত: দ্ব্যর্থহীণ ও রূপক। শরিয়তের ধারণা যে, গ্রন্থখানির কিছু বাক্য বা অংশ নির্দেশসুচক এবং বাকি অংশ রূপক। ধারণাটি দুর্বল সত্য বটে! কিন্তু তার চেয়েও কঠিণ সত্য যে, কোরানের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য অর্থাৎ পূর্ণ কোরানখানিই যেমন নির্দেশ-উপদেশ, ঠিক তেমনই পূর্ণ কোরানখানিই সীমাহীণ রূপক অর্থ বহন করে; প্রধানত: এভাবেই কোরান দু'ভাগে বিভক্ত।

অনুবাদকগণ তাদের অনুবাদে ঐ দু'টি ভাগ বাক্যে বা পৃষ্ঠায় ভিন্ন করতে গিয়ে বরং উভয়ের জগাখিচুড়ী করে ফেলেছেন; ফলে সাধারণের মর্মার্থ বুঝতে কষ্ট হয় এবং সন্দেহ জাগে। সাধারণ উপমা স্বরূপ: মদ, সুদ, শুকর ও হিজাব। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে: মদ: ইহাতে কল্যাণ আছে কিন্তু অকল্যাণ বেশি হেতু হারাম। কিন্তু যে ব্যক্তি মদের কল্যণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে তার কাছে মদ রহমত বলেই প্রমান করে। যেমন: শোনা যায় মদ ছাড়া খুব কম ঔষধই তৈরী হয়; যা শরিয়ত সাদরে গ্রহণ করে। সুদ:এবিষয় গবেষণা করলে দেখা যায় চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আরোপ করে গ্রহীতাকে সর্বশান্ত না করা। সুদ ছাড়া দুনিয়ার অর্থ নীতি অচল হয়। ইসলামী ব্যাঙ্ক নামের ব্যাঙ্কগুলিও সুদ মুক্ত নয়। শুকর: ইহার গোস্ত খাওয়া নিষিদ্ধ বটে! কিন্তু ঘৃণা করতে হবে, ছুলেই নাপাক হবে, লালন পালণ ব্যবসা করা যাবে না, লোম দিয়ে জামা কাপড়, লেপ তোষক, টুপি, জুতা-ব্রাস ব্যবহার করা যাবে না এমন কোন আদেশ নিষেধ আয়াতে নেই। হিজাব: কত ফুট ওড়না! মোটা-চওড়া কত! কতটুকু ঢাকতে হবে! চোখ ঢাকবে না বুক ঢাকবে! কত বয়স থেকে! রং কি হবে! ইত্যাদি নিয়ে আদিকাল থেকেই ঝগড়া-ফাছাদ। মুলত আয়াতটিতে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে এমন আদর্শ পোষাক ব্যবহার করবে, যাতে দেখামাত্র উশৃংখ্যল বখাটে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি ও উত্তেজনার সৃষ্টি না করে। হিজাব আরবের সকল পুরুষরাও পড়ে! কোরানের ৯৫ ভাগ আদেশ উপদেশই আক্কেল বা কমন সেন্স খাটিয়ে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। যা রায়হানের অধিকাংশ প্রতিবেদনেই উল্লেখ থাকে। তদুপরি ১০০ ভাগ স্বাধীনতা দিয়েছে গ্রহণ-বর্জনের। এমন একখানি নিরপেক্ষ গ্রন্থের বিরুদ্ধে যারা লড়েন! তাদেরকে অপ্রকৃতিস্থ বলতে সাহস থাকলেও না বলাই উত্তম। তবে একথা সত্য যে, অধিকাংশ বিষয়ই শরিয়ত এমনভাবে ঘৃনা ও আদেশ-নিষেধ আরোপ করে বেঁধে দিয়েছে যা আদর্শ ও রুচীশীল শিক্ষিত লোকদের সাধারণতঃ কমন সেন্সে বাঁধে। এজন্য কোরানকে দায়ী করা বোকামী, অনুবাদকে সেইই দায়ী করতে পারে, যে দার্শনিক অনুবাদ করার ক্ষমতা রাখে। শরিয়তের বিশ্বাস এমন যে, এগুলি সৃষ্টি করে আল্লাহ বড়ই অপরাধ করে ফেলেছে। পরিণামে সমাজের আধুনিক আভিধানিক শিক্ষিতগণ মোল্লাদের অনুবাদ ঠেকিয়ে আস্তিক থেকে নাস্তিক হন এবং অসৎ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন; অনুরূপ দেখুন:
'৬ দিনে সৃষ্টি', পৃথিবী বিছানার মত,' সূর্য কর্দমাক্ত জলে ডুবে, উল্কা-নক্ষত্রাদি জিনের (অনুবাদ জানা নেই) পিছনে ধাওয়া করে,' আদম হাওয়া প্রথম মানুষ,' মোহাম্মদ আল্লাহর বাড়ীতে দেখা করেছেন,' 'বিনা বাপে ঈছার জন্ম' 'ঈছা নবী ফিরে আসবেন' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভুগোল, বিজ্ঞান বা ভবিষ্যৎ কালের মতই কোরানের পূর্ণ অর্থ বোঝা এককালে একক বা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু কোরানই নয় বরং কবি-দার্শনিকদের লেখার বেলাও বেশি-কম সত্য; এমনকি কলেজ-ইউনিভারসিটির নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রী নেয়া ছাত্রদের বেলায়ও প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য। কোরানের মূল অর্থ প্রকৃতি ও কালের সঙ্গে ওৎপ্রতোভাবে জড়িত। কাল যত গড়াবে বিজ্ঞান সুত্র মতে উহার অর্থও পর্যায়ক্রমে বিবর্তনের ধারায় মানুষের বোধগম্য হতে থাকবে; ইহা নতুন কোন তথ্য নয় বরং ইহাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবর্তনের ধর্ম।

শিশু-কিশোরগণ 'বিয়ে' শব্দটি লক্ষ্য বার মুখস্ত করে হৃদয়ে গেঁথে রাখলে এমনকি বউ এনে দিলেও পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট জ্ঞান-কালে না পৌঁছা পর্যন্ত, উপলব্দি না হওয়া পর্যন্ত বউ'র কোলে উঠার চেষ্টা করবে! অথচ শিশু ভাবছে ইহাই যুক্তিসঙ্গত ও শেষ সত্য।

মহানবী নিজেও কোরানের অর্থ বোঝার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা এবং হা-হুতাস করতেন ; তাই আল্লাহ তাঁকে শান্তনা দিয়ে বলেন:
'ইহা বোঝার জন্য বক বক করিও না[' [সুত্র:৭৫: ১৬, ১৮] উহা হৃদঙ্গম করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি যে প্রেরণা দেই তুমি তাইই অনুসরণ করো--।
শরিয়তের বিশ্বাস মতে 'অহি মুখস্ত রাখার জন্যই মহানবী [সা] ঘন ঘন জিহ্বা নাড়তেন।' অতঃপর তিনি ব্যর্থ হতেন বলেই তো অহিটি নাজিল করে রাছুলকে শান্তনা দিয়েছেন। সুতরাং পূর্ণ কোরান রাছুলের যে মুখস্ত ছিল না বা প্রয়োজনও ছিল না, তা উল্লেখিত আয়াতটি জ্বলন্ত প্রমাণ। মুলত রাছুল [সা] অহি মুখস্ত করে প্রচলিত হাফেজ হওয়ার জন্য ঘন ঘন ঠোঁট নাড়তেন না, কারণ অহি আসার সঙ্গে সঙ্গেই ৪/৫ জনে লিখতেন; সুতরাং তাঁর ভুলে যাওয়ার যুক্তি কোথায়! শরিয়তের মতে, তিনি যখন মুখস্তই রাখতে পারতেন না বা পারেন নি! যা লক্ষ লক্ষ হাফেজগণ মুখস্ত করেছেন বলে দাবী করেন! তখন অসাধারণ এবং কঠিনতর বিষয় কোরানের পূর্ণ অর্থ বোঝা কি করে ধারণা করা যায়! অতএব মহানবী অহি মুখস্থ করার জন্য নয় বরং অর্থ বোঝার জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, যা কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না বলেই আল্লাহ স্থান-কাল-পাত্রভেদে বুঝিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। জলন্ত প্রমান: সংক্ষিপ্ত শব্দগুলির অর্থ মহানবী জানতেন না, হাদিছে নেই এমন কি আজও কেউ জানেন না।

প্রসঙ্গ ক্রমে:

চ্যালেঞ্জ দিয়ে ঘোষণা করা যায় যে, বিশ্বের প্রচলিত জীবিত বা মৃত কোন হাফেজেরই হুবহু পূর্ণ কোরান মুখস্থ ছিল না এবং আজও নেই। এই মাত্র নিজের লেখা কবিতা, গল্প বা সামান্য চিঠির দাড়ি-কমাসহ কেই বা মুখস্ত বলতে পারে! মাত্র একটি ছুরা বাকারা যে কেউ মুখস্ত করে সপ্তাহখানেক পর কোরানের কল্পিত মোজেজা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, হুবহু মুখস্ত করা ছুরাটি মুখস্ত আছে কিনা! মুসলিম বিশ্বের ধর্মপ্রাণ, আগ্রহশীল এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আহ্বান জানাই আন্তর্জাতিকভাবে সম্ভবপর না হলেও বাংলাদেশের অন্তত দশজন হাফেজদের হুবহু কোরান মুখস্ত আছে কিনা! তা প্রকাশ্যে গভীর সতর্কতার সাথে একটি ঐতিহাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। দৃঢ় বিশ্বাস যে, একজন হাফেজও শতভাগ কৃতকার্য হবেন না। কারণ হাফেজগণ পর্যায়ক্রমে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা দীর্ঘ কাল ধরে মুখস্ত করতে থাকেন এবং অংশ অংশ করে পরীক্ষা দেন; এভাবে মুখস্ত করেই তারা হাফেজ সনদ্ প্রাপ্ত হন। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ পূর্ণ কোরান মুখস্তের সরাসরি এবং প্রকাশ্যে ফাইনাল পরীক্ষাও নেন না। আর যতটুকু নেন তা প্রহসন, সন্দেহ ও পক্ষপাতিত্বের উর্দ্ধে থাকে না, যেহেতু তারাও পেশাদারী ধর্মব্যবসায়ী। তবে 'ব্যতিক্রম' শব্দটির আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকলেও মাত্র মুখস্ত কারীকে 'পুস্তক বহনকারী গাধার তুল্য বরং তার চেয়েও জঘন্য পশু এমন কি কাফের বলে কোরানে ঘোষনা করে। [দ্র: ২:১৭১; ৬২: ৫]।

সুতরাং প্রকৃত ধার্মীক ও নাস্তিকদের বৃহত্তর স্বার্থে এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে মৌলবাদীদের ১৪শ বৎসরের লালিত মোজেজা ও আল্লার সাথে গাদদারী ধরা পড়তো। শরিয়তি বিশ্বে হুলুস্থুল পড়ে যেতো! মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড নিয়ে সরকারের হাফানী শুরু হতো; ফলে নাস্তিকগণ ১টি পেনালটি সট্ পেতেন।

যাহোক মুল বিষয় ফেরা যাক:

৫৪: ১ নং আয়াতের অর্থ করা হয়েছে: 'কিয়ামত আসন্ন; চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে/দু'টুকরা করা হয়েছে।' আয়াতটির মুল দু'টি শব্দ 'ছায়াত ও সাক্বা।' ছায়াতের সাধারণ অর্থ হলো 'মৃত্যু;' কোরানে অসংখ্যবার 'ছায়াত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যার অনুবাদ করা হয়েছে 'কেয়ামত!' যদিও 'কেয়ামত' বঙ্গানুবাদ নয় এবং ঐ কেয়ামত শব্দটিও কোরানে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। বলাবাহুল্য সেখানেও শব্দটির বঙ্গানুবাদ করা হয়নি। ইংরাজি অনুবাদেও শাব্দিক অনুবাদ না করে বরং উহার তফসির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
'সাক্বা' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে: দু'টুকরা বা বিদীর্ণ। উহার সত্যাসত্য প্রমানের জন্য শরিয়ত মহানবীর আঙ্গুলের ইসারায় চাঁদ দু'টুকরা হয়েছিল বলে কল্পিত হাদিস রচনা করেছেন।
মুলত: 'সাক্বা' শব্দটির অর্থ: দু'টুকরা, দু'ভাগ, ফিরানো বা ফিরিয়ে রাখা, বিদীর্ণ ও অতিক্রমসহ বহু অর্থ বিদ্বমান। অতপর 'সাক্বা' শব্দের আগে ভবিষ্যৎ চিহ্ন 'নু' বর্ণ যোগ করা আছে, অর্থাৎ 'নুসাক্বা;' আপাতত: উল্লেখিত অর্থে হওয়া উচিৎ: দু'টুকরা হবে/ দু'ভাগ হবে/ ফিরাবে/ অতিক্রম করবে/বিদীর্ণ হবে ইত্যাদি। সুতরাং মহা নবীর নামে 'চাঁদ দু'টুকরা' হাদিসটির সত্যতার কোনই ভিত্তি নেই। আরো তাজ্জবের বিষয় যে: চাঁদ তো আদিকাল থেকেই পূর্ণিমার দিনটি ছাড়া দু'টুকরা হয়েই আছে! অন্য কথায় মাত্র এক টুকরা বা একপিঠ ফিরিয়ে রেখেছে। অনাদিকাল যাবৎ চাঁদের নাকি একপিঠ বা এক টুকরাই পৃথিবী থেকে দৃষ্ট হয়!
আরবী 'সাক্বা'র আরও একটি প্রচলিত আঞ্চলিক অর্থ 'সাঁকো, সেতু' বা গ্রাম গঞ্জের ছোট পুল। অতএব এবারে যদি কেহ বলে যে, রকেট, চাঁদ আবিস্কার, চাঁদ অতিক্রম করা! চাঁদ কোন এক কালে বিস্ফোরিত বা বিদীর্ণ হয়েছিল বা হবে ইত্যাদি ১৪শ বৎসর পূর্বেই

মোহাম্মদ (সা) বলে গেছেন (হয়তো তিনি জানতেন না)। তবেই তো নাস্তিকগণ হেরে অতপর তেড়ে আসবেন! আর জামিলুল বাসারকে রাহা খরচ দিয়েই হেমায়েতপুর পাঠাবেন।

৩:৭ নং আয়াতটির প্রচলিত অনুবাদেও ভিন্ন মত্ আছেঃ

১. -- আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উহার (রুপক) অর্থ জানে না এবং--। [ইসলামিক ফাউন্ডেসন ও অন্যান্য]

২. -- অথচ ইহার ব্যাখ্যা জানেন আল্লাহ এবং জ্ঞানে পরিপক্ব লোকগণ--। [আহমদিয়া মুসলিম জামাত]

অতি পুরাতন সুত্রে উল্লেখিত আয়াতটির সমস্যা প্রায় নিম্নরুপঃ

'এখানে প্রস্রাব করিবেন না করিলে ৫শ টাকা জরিমানা।

'এখানে প্রস্রাব করিবেন না, করিলে ৫শ টাকা জরিমানা।'

'এখানে প্রস্রাব করিবেন, না করিলে ৫শ টাকা জরিমানা।'

বাক্যের সবচেয়ে গুরুত্বহীণ ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ' ,' কমাটি নিয়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্বমান! যে কমাটি কোরানে নেই, আছে 'এবং/বা/অথবা।' শব্দ ৩টি ব্যকরণের চাপে প্রধানতঃ এমন জাযগায় বসে যার দু'কুলের সম বা সামঞ্জস্যতা রক্ষা/যুক্ত করে। মুলত যাদের বিদ্রোহ করাই সর্ব প্রধান ধর্ম তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কমন সেন্স খাটাবেন না; মৌলবাদীরাও নয়। সুতরাং এখানে দু'দলই বিপরিতার্থক কিন্তু সম-আসনে অধিষ্ঠিত। অনন্তবিজয়ের নিতান্ত পরাজয় কামনা করি না, চাই প্রশান্ত হৃদয়।।

পঞ্চম ও চুড়ান্ত কারণঃ

বুঝলেই অস্তিত্বের প্রশ্ন! সুতরাং বুঝবোই না! কার সাধ্য বুঝাবার!!

আসলেই যদি আল্লাহকে এ্যারেষ্ট করে আস্তিক্য ধর্ম বিনাস করে নাস্তিক্য ধর্ম বহাল করতে চান! তবে তাদের সর্ব প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য অন্তত নেতাদের পবিত্র (নিরপেক্ষ ও ন্যায়বাদী) হয়ে আরবী ভাষার পান্ডিত্য অর্জন! অতপর কবি দার্শনিক হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। অন্যথায় শরিয়তের মাথায় লবণ রেখে তেতুল খেতে গেলে উভয়ই হারাবার সম্ভাবনা অধিক।

বিনীত